শহীদুল জহিরের ছোটগল্প: বিষয় ও বৈচিত্র্যে

[সার-সংক্ষেপ: Shahidul Zahir (1953-2008) was a uniquely talented fiction writer with creative style. His acute awareness of contemporary experience, skillful use of colloquial language, native cultural titbits, and modern literary theories of his time, particularly Magic Realism, cemented his name in Bangla Literature. Every fiction tells different story, every character gives different points of view. His versatile plot and idiosyncratic style amazed all, readers and critics alike, and met much criticism. Does he has something new or it is just his labyrinth-like story telling style makes him unparalleled? Is it Magic Realism or the same old folk-tale in a new blend that we have already in our lores? The following write-up discusses these issues. He held his well-neat stories as one holds sands in ones palms, slowly releasing them, in layered expressions, which both puzzled and excited his readers like an abstract painting.]

বাংলা ছোটগল্পের উত্তরাধিকারে ভিন্নধারার কথাশিল্পী শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) এর আবির্ভাব জীবনানন্দ দাশের মতো শিল্পীসত্তায় নির্জনতাকে সঙ্গী করে । বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে তিনি সংযোজন করেছেন অসামান্য কিছু গল্প। তাঁর গল্পের জীবনসংবেদী বিষয়, অভিনব আঙ্গিক, অন্তরঙ্গ চরিত্র– আর সবকিছু ছাপিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় সমৃদ্ধ বিচিত্র বর্ণনাকৌশল বাংলা সাহিত্যে অভিনব সংযোজন।

আবহমান সমাজকাঠামোর পুরনো গল্পগুলোই তিনি নতুন করে উপস্থাপন করেছেন, আর তাঁর অভূতপূর্ব উপস্থাপনভঙ্গির কারণে সেগুলো স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। তিনি বহির্বাস্তবকে গৌণ করে অন্তর্বাস্তবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বাস্তব-অবাস্তবের খেলায় বাস্তব ধরা দিয়েছে তীব্রভাবে। জাদুর ঘোর লেগে গেলেও তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবই থেকে গেছে। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে এ ধারা শুরু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র হাত ঘুরে শহীদুল জহিরে এসে তা পুষ্ট হয়েছে এবং স্বকীয় বর্ণনাশৈলিতে পূর্বসূরীদের আড়াল করে তিনি উজ্জ্বল হয়ে আছেন, বলাই বাহুল্য।

ভাষার অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহারে তৈরি করেছেন তাঁর জাদুর কুহক। কথাসাহিত্যে অভিনব গদ্যভঙ্গির চর্চা তাঁকে অনন্য করে তুলেছে। আঞ্চলিক কথ্য ভাষাভঙ্গির অনায়াস ব্যবহার তাঁর গদ্যশৈলীকে করে তুলেছে শক্তিশালী আর তার চরিত্রগুলোকে দান করেছে মাটিঘেঁষা শেকড়সন্ধানী অভিযাত্রা। বেশিরভাগ গল্পের চরিত্রগুলো তাঁর জন্মস্থান পুরান ঢাকা, কখনও পৈত্রিক নিবাস সিরাজগঞ্জ, পিতার কর্মস্থল ময়মনসিংহ বা সাতকানিয়ার ভাষায় কথা বলে। চরিত্রের সম্মিলিত ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার ঋজুতা দান করেছেন। নিরাবেগ নিস্পৃহতা নিয়ে তাঁর কথন ব্যাপৃত হয়েছে। ব্যক্তির সমস্ত আবেগ তাঁর ভাষার পেছনে রুদ্ধ হয়ে ভাষাকে দিয়েছে নতুন ঋদ্ধি। শহীদুল জহির বর্ণনায় টাইমফ্রেমকে ভাঙতে চেয়েছেন, সময়ের একতল থেকে অন্য তলে অনায়াসে যাতায়াত করতে চেয়েছেন। তাঁর গল্পের সময়ক্রম যেন জাদুকরের হাতের অলাতচক্র, ক্রমাগত ঘূর্ণিতে যা সৃষ্টি করে চলে দৃষ্টিনন্দন গোলোকধাঁধার, আর চক্রমণ শেষ করে যখন অগ্নিগোলোক শুরুতে ফিরে

গিয়ে থেমেছে, তখন তাঁর জাদু দেখানোও শেষ হয়েছে। এভাবে সময়ের ক্রমকে বারবার ভেঙে দিয়ে তিনি সময়কে নিজের সুবিধামত করে নিয়েছেন চির বর্তমান।

পুরান ঢাকার যৌথ জীবনাচরণ, সামাজিকতা, সামষ্টিক ঘটনাপঞ্জি শহীদুল জহিরের গল্পের প্রধান অনুষঙ্গ। বিংশ শতাব্দীতে মানুষে মানুষে স্বনির্মিত বিচ্ছিন্নতার দেয়াল তৈরি হয়েছে; পরিবার বা সমাজে জনারণ্যে থেকেও সে বাস করে একাকিত্বের বদ্ধতায়, পুরান ঢাকা যে এর ব্যতিক্রম তা তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। তাই 'আমি' নয় 'আমরা', 'মহল্লার লোকেরা', 'ভূতের গলির লোকেরা বলে যে', 'স্মরণ করতে পারে যে', 'ভুলতে পারে না যে', 'নিশ্চিত হয়', এই ঘটনার কথা জানতে পারে'– এভাবে তিনি জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে সামষ্টিক চেতনা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর লেখায় অনিশ্চয়তা বা অমীমাংসাই যথার্থ পরিণতি। কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মত প্রকাশের ক্ষেত্রে দায় যেন কোনো চরিত্রের একার নয়, তাতে সাধারণভাবে মহল্লার লোকদের যুক্ত করেছেন। এভাবে চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে সময় ও সমাজের প্রতিবিম্ব।

বস্তিজীবন থেকে যে গল্পধারার শুরু তা সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে পেরিয়ে খুব উঁচুতে যেতে পারেনি। তাঁর গল্পে উচ্চবিত্ত চরিত্র খুবই কম, যেমন কম উচ্চশিক্ষিত বা এলিট শ্রেণির চরিত্র। আবদুল মান্নান সৈয়দ তাই বলেছেন, "তাঁর তাবৎ গল্প থেকে একটি চারিত্র্যই উদ্ভাসিত হয়– সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষের জীবনযাপনের চিত্রণই তাঁর লক্ষ্য। বহির্জীবনই অনেকখানি, তারই মধ্য দিয়ে অন্তর্লোকে যাত্রা। এ বহির্জীবনের পটভূমি বাংলাদেশের, শুধু ঢাকা শহর নয়– ঢাকার বাইরেরও কোনো কোনো স্থান নির্বাচন করে নিয়েছেন এবং গভীর সততা ও নিবিষ্টতার সঙ্গে তার রূপায়ন ঘটিয়েছেন।"[১]

প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্যজীবনে তাঁর প্রকাশিত গল্পসংখ্যা উনিশটি, তিনটি উপন্যাস, অপ্রকাশিত কয়েকটি ছোটগল্প, অনুবাদগল্প, একটি উপন্যাস এবং কিছু কবিতাও রয়েছে। যা পরে 'শহীদুল জহির সমগ্র' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাঁর গল্পগ্রন্থ *পারাপার (১৯৮৫), ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প (২০০০), ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প (২০০৪)*।

দুই.

'*পারাপার*' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব আছে। তিনি সমাজে বঞ্চিতদের কথা বলতে চেয়েছেন, তাদের জীবনসংগ্রামের কথা এবং সেই সংগ্রামে জয়লাভের কথা বলতে চেয়েছেন। সমাজে বঞ্চিত, দলিত মথিত মানুষগুলোর মধ্যে একধরনের ঋজু দৃঢ়তা, প্রতিবাদ ও প্রত্যয় এই পর্বের গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠে। লেখক নিজেই বলেছেন, 'পারাপার বইটাই গরিব লোকদের নিয়া লেখা, শহরের গরিব, গ্রামের গরিব।'[২]

প্রথম গল্প 'ভালোবাসা'(১৯৭৪) বাবুপুরা বস্তি এলাকার গল্প। বস্তিবাসী হাফিজদ্দি এবং তার স্ত্রী আবেদার প্রাত্যহিক নিস্তরঙ্গ জীবনে ক্ষণিকের জন্য ঢেউ তোলে হলুদ রঙের ডালিয়া ফুল। বস্তির মেয়েদের প্রায় সবাই কাছাকাছি কোনো বাড়িতে ঠিকা ঝিয়ের কাজ করে, পুরুষরা হয় ঠেলাগাড়ি ঠেলে বা দিনমজুর। ঝুপড়ির এক ঘরে ঠাসাঠাসি করে দিনাতিপাত করে। এমনি এক পরিবেশে হাফিজদ্দি ডালিয়া ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরলে সবার মধ্যে ঔৎসুক্য তৈরি হয়। আর 'আবেদার বুকের ভেতরটা কেঁপেছিল কী এক সুখে। হঠাৎ ঝরা বৃষ্টির পর পোড়া চরাচরের মতো আবেদার মনে হয় কী আরাম বৃষ্টির এই অনাবিল জলে ভেজায়।'[৩] সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষদের জীবনে ভালোবাসার পেলব উৎস হয়ে দাঁড়ায় ফুলটি। তাই 'তহুরা তো জানে না বাবা মাকে কী জাদু করে রেখে বাইরে গেছে।'[৪] লেখকের অসামান্য দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ফুলটিই শেষ পর্যন্ত গল্প হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় গল্প 'তোরাব সেখও (১৯৭৫) বস্তিজীবনের প্রাত্যহিকতা, স্বপ্ন-বাস্তবতা আর জীবন সংগ্রামের গল্প। তোরাব সেখ, লতিকা, জমির, লালবানু প্রত্যেকেই অস্তিত্বসংগ্রামী। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে জীবনের ঘানি টেনে যাচ্ছে যারা তারা জেগে উঠলেই বদলে যাবে পৃথিবী, মার্কসীয় এ বিশ্বাসের প্রতিফলন এ গল্প। ঠিকা ঝিয়ের কাজ করে বস্তির নারীরা স্বাবলম্বী। কারো কথায় তাদের জীবন আবর্তিত হয় না। বড়লোকের সাম্রাজ্য থেকে মাঝে মধ্যে চুরি করে কিছু আনলেও সেটাকে নিজেদের অধিকার বলেই মনে করে তারা। কারণ তাদেরকে শোষণ করেই ধনীর উদর আজ এমন স্ফীত। লালবানু কানের দুল চুরি করে ঘরে আনলে তাই সবার সমর্থন পায়। তার মা তার সমর্থনে ব্যক্তিত্ববান তোরাব সেখকে বলে, 'এমুন কতা হুনায়ো না তুমি, চুরি করে না কোন সাবে?'[৫]

লেখকের জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা, সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে "পারাপার"(১৯৭৫) গল্পে। গণমানুষের নিয়তিতাড়িত জীবনধারার পরিবর্তনে শৈশব থেকে প্রাণান্ত চেষ্টার গল্প এটি। ছোট দুটি শিশু আবুল আর বশিরের জীবন সংগ্রাম, সমাজের উঁচুতলার মানুষদের নির্দয় আচরণ, এবং তাদের রোষানল থেকে মুক্তিপ্রত্যাশা গল্পটিকে অনন্য করেছে। সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য অত্যন্ত সহজ পরিসরে উঠে এসেছে। ওলি চরিত্রটির অবস্থান এই দুই শ্রেণির মাঝে। তাই সরকারি কর্মকর্তার খুব ভারি বেডিং যখন আবুলের হাত থেকে স্টিমারঘাটের পানিতে পড়ে যায় তখন– 'ওলির ইচ্ছে হলো যে বলে, স্যার, আমি আপনের বান্দা। কিন্তু স্যার বেয়াদবি মাফ করবেন এক টাকায় এমন মাল টানাইতে গেলে সে মাল স্যার পানিতেই পড়ে। ওলির ইচ্ছে হলো অট্টহাসিতে চারদিক ডুবিয়ে দিতে। কিন্তু সে হাসল না, সতর্ক হলো, যাতে মুচকি হেসে না ফেলে। সতর্ক করল ওকে সেই ভয়। ও শুধু বলল, কেউ ইচ্ছা কইরা এমন কাম করে না।'[৬]

সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ জীবন, স্বাভাবিক অশ্লীলতা বা সাবলীলভাবে কোনো বাচ্চার জন্ম নিয়ে কথা তোলা গ্রামীণ আবহে সম্ভব। মানুষ সামাজিক বিষয়ে গালগল্পের ওপর নির্ভরশীল। গ্রামীণ সংস্কৃতির নিবিড় অবলোকন থেকে উঠে আসা এমনি একটি গল্প "মাটি ও মানুষের রং" (১৯৭৬)। ভূমিহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও 'একটু গরিব' বলে আত্মপ্রবঞ্চনা এ গল্পে পরিলক্ষিত। আসিয়া নামের মেয়েটি সাতমাসের বাচ্চা কোলে নিয়ে পাশের বাড়ি বেড়াতে গেলে বাচ্চার গাত্রবর্ণ নিয়ে কথা ওঠে। স্বামী-স্ত্রী কালো হওয়া সত্ত্বেও বাচ্চা ফর্সা হওয়ার কারণ কী হতে পারে, গ্রামীণ সমাজে এও এক গবেষণার বিষয় এবং পরিষ্কার ইঙ্গিতে আসিয়াকে বলা হয় 'ছিনাল'। সেও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। চাচিকে সে জানায়, 'চাচি সাত গেরাম দূরে বিয়া দিছইন; একদিন আপনেরে আমার বাইত লইয়া যামু।... দেকবাইন চাচি, রোইদে কেমুন ক্ষেত জ্বইলা জ্বইলা কালা অয়। খেতের উপরে মানুষ জ্বলে কালা কয়লার লান। সারা শরীল খালি, শুধু কুমরে কাছা দেওন লুঙ্গি।... আমার সোয়ামীর কুমোরের লুঙ্গি খুইল্লা দিলে বুজার পারবেন আমনেরও এইরম পোলা অইতো পারে। আমার ছিনাল হওন লাগে নাই সুন্দর পোলার লাইগ্গা।'[৭]

ঈর্ষাপ্রসূত গ্রাম্যঅশ্লীলতায় সন্তানের জন্ম নিয়ে এমন কথা বলা অন্যকে আঘাত করার মোক্ষম অস্ত্র। গাত্রবর্ণের ফর্সা-কালোর বর্ণবাদী সমাজের, ঈর্ষাকাতর সামন্তবাদী সমাজের বিরুদ্ধে যথোচিত তীব্রতায় আসিয়ার প্রতিবাদ শ্রেণিহীন সমাজের রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় যেন।

"ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে"(১৯৭৬) গল্পে সামাজিক পীড়ন, শোষণে পিষ্ট সহায়হীন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ নবাব। সে সমগোত্রের প্রতিহিংসার শিকারও বটে। নিজেকে বড় করতে না পেরে অন্যকে ছোট করে দেখানোর চিরন্তন মানবীয় হীন মনোবৃত্তি এস্থলে লক্ষ্যণীয়। নিম্নশ্রেণির মানুষের তাই অপরের জীবন সম্পর্কে অহেতুক কৌতুহল। নিরীহ নবাবকে কোনোভাবেই শায়েস্তা করতে না পেরে ঘৃণ্য অপবাদ দিয়ে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করে। খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে এটাও এক বিনোদন। শহীদুল জহিরের আঞ্চলিক ভাষার বিচিত্রবর্ণা মুকুটে ভিন্ন পালক যোগ করেছে এ গল্পে নবাবের মুখের ভাষা। তার প্রকৃত নাম আলফাজুদ্দিন

আহম্মদ। পুরান ঢাকার চরিত্রে লেখক সতত যেসব নাম ব্যবহার করেছেন, এ নামটি সেগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম। তেমনি ব্যতিক্রম নবাব চরিত্রটি। অত্যন্ত প্রমিতভাষী নবাব চালচলনে এ সমাজে বেমানান। তাই তার প্রতি সবার অবিশ্বাস একসময় আক্রোশে পরিণত হয়।

তিন.

'*পারাপার*' এর পরবর্তী গল্পগ্রন্থের জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৫ বছর। 'পারাপার' এর গল্পগুলো তাঁর ২১ থেকে ২৩ বছর বয়সেলেখা। অন্যদিকে ২য় গল্পগ্রন্থ '*ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প*' র ১ম গল্পটি লেখা তাঁর ৩৮ বছর বয়সে অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যমানস তখন আরও পরিণত। ততদিনে তাঁর উপন্যাস 'জীবন এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা' (১৯৮৮) এবং 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' (১৯৯৫) প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলো বাংলা উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার সফলতম প্রয়োগ বলে স্বীকৃত। '*ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প*' নিয়ে ২০০০ সালে তিনি যখন আবির্ভূত হলেন, তখন তার বাস্তব আর জাদুর জগৎ এক হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর গল্পের আঙ্গিক আর ভাষাশৈলী চলে এসেছে দৃষ্টিসীমার কেন্দ্রবিন্দুতে। তবে চরিত্রেরা রয়েছে পুরনো শ্রেণি-পেশার বা বর্গের। বেশিরভাগ গল্পে পুরান ঢাকার এমন একটি এলাকা বা মহল্লাকে বেছে নিলেন যেখানে জীবন সরলরৈখিক হলেও বৈচিত্র্যে ঠাসা। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত এসব মানুষ কখনও আঁকড়ে থাকে তাদের চিরায়ত ধ্যান-ধারণায়, কখনও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের সঙ্গে 'ইন্দুর-বিলাই খেলা' খেলে আবার কখনও নিজের অজান্তেই কোনো মহৎ কাজের অংশীদার হতে এগিয়ে আসে। ঘটনার পুনাবৃত্তি থাকলেও তাঁর আশ্চর্য বর্ণনকৌশলের কারণে পাঠকের মুগ্ধতা কাটে না।

'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' (১৯৯১) গল্পের আবদুস সাত্তার একজন মধ্যবয়স্ক কেরানি যে বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় একটি চেয়ারে আশ্রয় নেয়। সংসারের কোনো কলরব, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বা দৈনন্দিন কোনো বিষয় তাকে স্পর্শ করে না। গভীর রাত অবধি সেখানে সে বসে থাকে। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্ববিচ্ছিন্নতা তার চরিত্রে পাওয়া যায়। গল্পে পাওয়া যায়, 'সে তখন বারান্দায় অন্ধকারের সঙ্গে মিশে থাকে। সে দেখে দিনের আলো মুছে যাওয়ার পর অন্ধকার কেমন গভীর আর স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে, সে তাকিয়ে থাকে শুধু, এতে তার কোনো আনন্দ বা ক্লান্তি হয় না, যেমন কেরানি সরকারি চাকরিতে ক্লান্তিবোধহীনভাবে লেগে থাকে।'[৭]

আগারগাঁও কলোনিতে সমমর্যাদার সরকারি কর্মচারিদের বাস। জীবনের টানাপোড়েন তারা ভুলে থাকতে চায় টবে লাগানো নানা জাতের গাছের প্রতিপালন ও পরিচর্যায়। একসময় ফুলগাছগুলো এ গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠে। আবদুল করিম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জড়িয়ে যায় বিশেষত্বহীন ফুল নয়নতারার সঙ্গে। ভূমিকম্পের সময় দুটো নয়নতারার টবকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে সে নিজেই চারতলা থেকে পড়ে মগজ থেঁতলে মারা যায় এবং পরবর্তীতে তার শোকে গাছগুলো আত্মহত্যা করতে থাকে। এমন একটি জাদুবাস্তবতার চিত্র তিনি এঁকেছেন যা একইসঙ্গে পাঠকের মোহগ্রস্ততা এবং ধন্দ তৈরি করে। এ গল্প থেকেই তিনি জড়িয়ে গেলেন জাদুর জগতে যা পরবর্তীতে আরও বিকশিত হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ ও ঢাকা শহরকে এক সূত্রে বেঁধেছেন 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' (১৯৯২) গল্পে, ভূমিহীন অতিদরিদ্র আকালু ও তার স্ত্রী টেপি, রিকশাচালক চান্দু এবং তাদের সারল্যমাখা জীবনাচরণে। ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাকের অলৌকিক ভূমিকা, তাদেরকে সিরাজগঞ্জ থেকে তাড়া করে ঢাকায় আনা এবং পুনরায় সিরাজগঞ্জে ফিরিয়ে নেয়ার অসম্ভব চিত্র চিত্রণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত অশুভ বা অলক্ষুণে হিসেবে পরিচিত কাককে শুভলক্ষ্মী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ গল্পে কাক একটি শক্তিশালী চরিত্র। গ্রামের দরিদ্র কাঠুরে থেকে শহরের রিকশাচালক এবং তার ছায়াসঙ্গী হিসেবে টেপি প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে কাকের হাতেই নিজেদের সমর্পণ করে। দয়াগঞ্জ বস্তিতে কাকের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাদের জীবনে নতুন করে সংকটের শুরু হয়। জ্যোতিষির পাথর চুরির মিথ্যা অপরাধে দুজনই জেল খাটে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জেলার সাহেবের নয়াটোলার বাসায় তারা আশ্রয় পায়। বরাবরের মতোই তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী কাক এখানেও হাজির। তখন আকালু ও টেপি তাদের 'ভবিষ্যৎকে মেনে নেয়' এবং কাকের জন্য বাঁশের মাচা তৈরি করে দেয়। তারা কাকের ডিম খায়, কাকের আনা লোহার তার, সাইকেলের স্পোক ও ইস্পাতখন্ড মিলে মোট সাড়ে আঠারো মণ লোহা বিক্রি করে এবং প্রতিবেশিকে কাকের দেয়া সোনার দুল উপহার দেয়। এই ঘটনার পর কাকের আনা মূল্যবান সম্পদরাজির লোভে ওদের প্রতিবেশিরা ভয়ংকর হয়ে ওঠে এবং লাঠি, বল্লম ও লোহার রড নিয়ে আকালুর ঝুপড়িতে প্রবেশ করে। তখন রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থিত হয় কাক এবং আকালু ও টেপিকে তারা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় সিরাজগঞ্জের দিকে। জাদুবাস্তবতার অনন্যসাধারণ উপস্থাপনারীতির কারণে আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনায়ও পাঠক খেই হারিয়ে ফেলেন না।

শহীদুল জহিরের একটি ভিন্নধর্মী গল্প 'ডুমুরখেকো মানুষ' (১৯৯২)। মুখে 'রহস্যময় হাসি' ঝুলিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কে জাদু দেখিয়ে আর জগডুমুর বিক্রি করা জাদুকর মোহাব্বত আলির জাদুতে মোহিত হয় রাস্তাঘাটের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। আর তারা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার জগডুমুর খেয়ে। তার নানা ছলাকলা আর বিজ্ঞের মতো কথাবার্তায় ডুমুরের প্রতি মানুষের আসক্তি বাড়ে। বাজার সংস্কৃতির যুগে একটি অপ্রচলিত ফল এভাবে কিছু মানুষের নেশার বস্তুতে পরিণত হয়। ডুমুরের দাম চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকায় তাদের ক্রয়সীমার বাইরে চলে যায় তাই তারা ডুমুর গাছ কিনতে আগ্রহী হয়। গাছ না পেয়ে মোহগ্রস্ত এ মানুষেরা জাদুকরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং একসময় নিজেরাও মৃত্যুবরণ করে। জাদুকরের রহস্যময় হাসির মতোই লেখক রহস্যাবৃত করে রেখেছেন গল্পের শেষ অংশ। তাই গল্প শেষ করে পাঠককে ভাবতে হয় 'এতক্ষণ যা কিছু ঘটেছে তা স্বপ্ন ছিল।'

নরনারীর হৃদয়াবেগ ও প্রেম নিয়ে শহীদুল জহির বিভিন্নভাবে নিরীক্ষা চালিয়েছেন এমনি একটি গল্প 'এই সময়' (১৯৯৩)। এই গল্পে মোহাম্মদ সেলিম এক ব্যতিক্রমী কিশোর চরিত্র যে বাবা মায়ের কবরে ফুল দেয়ার জন্য নিজে ফুলের বাগান গড়ে তোলে। যদিও ফুলের ঘ্রাণের চেয়ে দুধের ঘ্রাণ তার প্রিয়। রূপবতী নিঃসন্তান শিরিন আকতার বিধবা হয়ে বাবার বাড়ি ফিরে এলে তার প্রেমে পড়ে মহল্লার মাস্তান আবু, বিপত্নীক এরশাদ সাহেব, মাওলানা জব্বার, মেজর ইলিয়াস প্রভৃতি শক্তিশালী মানুষেরা। তারা প্রত্যেকেই তাদের বাসনা জানিয়ে নানাবিধ উপহার সামগ্রী পাঠায় শিরিনের জন্য। আবু, হাবু ও শফি তিন মাস্তান ভাইয়ের নির্দেশে শিরিন আকতারের চাহিদামতো প্রতিদিন ফুল নিয়ে আসে কিশোর মোহাম্মদ সেলিম। এই মোহাম্মদ সেলিমের প্রতিই শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয় শিরিন। পরিণতিতে সেলিমকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়। মহল্লার পেশিশক্তির কাছে সাধারণ মানুষের জিম্মিদশার বাস্তবচিত্র পাওয়া যায় এ গল্পে। 'প্রত্যেক মাছে এত্তগুলান কইরা ট্যাকা' দিয়ে সমাজপতিরা মাস্তানদের লালন করে। সন্ত্রাসী ভাতৃত্রয়ের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, 'গেঞ্জিহীন খোলা শার্টের নিচে ব্যায়ামপুষ্ট বুকের মাঝখানে সোনার চেন ঝুলে আছে। প্রত্যেকের বাঁ কানের লতি ছিদ্র করা এবং তাতে একটি করে পাথরের ফুল'[৮]। পুরান ঢাকা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। বাল্যবিবাহ এখানে স্বাভাবিক, নৈমিত্তিক। তাই আট বছর বিবাহিত জীবন শেষে বিধবা শিরিন আকতারের বয়স বাইশ বছর। জোরপূর্বক বিয়ে বা বহুবিয়েও

এখানে দুর্লভ নয়। পেশিশক্তির কাছে পরাজিত নারী বা তার পরিবার। শিরিন আকতারকে জোরপূর্বক বিয়ের সময় 'তিনবার শিরিন আকতার না বলে এবং তিনবারই ঘরের লোকেরা বলে, কবুল করছে এবং তারপর বলে বিয়া হয়া গেল, অখন আমরা যাই।'[৯] যেখানে আবু, হাবু, শফিদের ইচ্ছাই আইন সেখানে মোহাম্মদ সেলিমকে হত্যার পর তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তাদের কোনো অপরাধ খুঁজে পায় না। এবং মহল্লার লোকেরা বলে 'তিনভাই ভালো ছেলে'। কর্কশ বাস্তবতার অসাধারণ বয়ানরীতি আর নির্মাণ-কৌশলে গল্পটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

শহীদুল জহির মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন পুরান ঢাকায় অবস্থান করে। তাই তাঁর গল্প উপন্যাসের আঙ্গিক যেমন গড়ে উঠেছে পুরান ঢাকাকে কেন্দ্র করে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধও অনুসঙ্গ হয়ে এসেছে। 'কাঁটা'(১৯৯৫) গল্পে যুদ্ধের সময় সংখ্যালঘু সুবোধচন্দ্র ও স্বপ্নার প্রতি যদিও সবাই অসহায় মমতা অনুভব করে কিন্তু আপন অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তাদেরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি তারা। দীর্ঘদিন পর আবার সুবোধচন্দ্র ও স্বপ্না একই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসে এবং একইভাবে কুয়ার পানিতে পড়ে মারা যায়। এরপরও তারা ওই বাড়িতে আসে এবং বাবরি মসজিদ ভাঙার খবর শুনে মিষ্টি কিনে খায়। এই অপরাধে মহল-ার মানুষ আবারও তাদেরকে কুয়ার পানিতে ফেলে হত্যা করে। লেখক সময়ের বিভিন্ন তলে অবস্থান করে একাধিক সুবোধচন্দ্র আর তার স্ত্রীর একইরকম মৃত্যুর বর্ণনা দেন। 'কাঁটা' বলতে লেখক হয়তো সাম্প্রদায়িকতার কাঁটাকে বুঝিয়েছেন যা বিষবাষ্প হয়ে আছে মানুষের মনের গহীনে। কখনও অতীতে কখনও বর্তমানে অবস্থান করে স্বপ্নকল্পনার মতো সুবোধচন্দ্র ও স্বপ্নার পৌনঃপুনিক আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান পাঠককে জাদুবাস্তবতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে– "এই বিভ্রান্তির ভেতর তাদেরও এরকম মনে হয় যে, তারা হয়তো কোনো এক জায়গায় কোনো এক স্বপ্নের ভেতর তারা অতীত থেকে ভবিষ্যতে অথবা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এবং তাদের মনে হয় যে সুবোধ ও স্বপ্নার বিষয়টি হয়তো সত্য নয়, স্বপ্ন।"[১০] এ গল্পে লেখক গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে জনজীবনে যুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র এঁকেছেন যা পাঠককে আলোড়িত করে।

নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখা গল্প 'ধুলোর দিনে ফেরা' (১৯৯৭)। আবদুল ওয়াহিদ নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রাম ছাড়ে। যাওয়ার আগে সে তার প্রেমিকাকে দুটো পাখির ছানা দিয়ে যায়। নূরজাহান সেগুলোকে ময়না ভেবে কথা শেখাতে চায় কিন্তু শত চেষ্টায়ও পাখিগুলো কথা বলে না। কারণ সেগুলো ছিল শালিক পাখির ছানা। একুশ বছর পর ওয়াহিদ ফিরে এসে দেখে নূরজাহান এখন তার বন্ধু আবুল হোসেনের স্ত্রী। বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাওয়ার পর প্রথমেই নূরজাহান তাকে জিজ্ঞেস করে, 'ম্যাবাই, ময়নার ছাও কয়া আমাক শালিক দিছিলেন ক্যা?'[১১] ওয়াহিদ তাই এবার দুটো ময়নার ছানা কিনে কথা শেখায়। তার মৃত্যুর পর পাখিগুলোকে নূরজাহান নিজের কাছে এনে রাখে এবং তাদের মুখে অদ্ভুত কথা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। পাখির রূপকে লেখক নূরজাহান ও আবদুল ওয়াহিদের মনোবিশ্লেষণ করেছেন যা প্রেম সম্পর্কে পাঠকের উপলব্ধিকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়।

একই চরিত্র একই মহল্লা শহীদুল জহিরের গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে। কখনও মহল্লাও আবির্ভূত হয়েছে চরিত্র হিসেবে। এই পরিচিত গন্ডির মধ্যেও লেখক কখনও চিত্রিত করেছেন সামষ্টিক জীবনাচরণ, আবার কখনও ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, একরৈখিকতা। এমনি একটি গল্প 'চতুর্থমাত্রা' (১৯৯৮)। এটিকে গল্প না বলে 'একাঙ্কিকা' বলা যায়। নিঃসঙ্গ আবদুল মজিদ একাকিত্ব থেকে মুক্তির আপাত যে উপায় বের করেছে, তা হলো সংবাদপত্র বিক্রি। ফেরিওয়ালাকে ডেকে তার সঙ্গে দরকষাকষি করা, সময় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা এবং ঘরে বিক্রয়যোগ্য কাগজ না থাকলে তার কাছ থেকে কিনে পুনরায় বিক্রি করা– মাঝে মাঝে তার ঘরে গৃহকর্মীর কাজ করা – এ প্রাত্যহিকতাকে লেখক যেন পর্দার আড়াল পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রতিদিন ঘরের গ্লাস ভেঙে–

দরজার বাইরে রেখে আবদুল করিম অপেক্ষা করে মহল্লার ছেলেদের হট্টগোল শোনার, কখনও তাদের বাবাদের সঙ্গেও কথা বলার। তাদের আবদার রক্ষার জন্যই একসঙ্গে দুটো বা তিনটা গ্লাসও ভাঙতে হয় তাকে। আবার স্বপ্নেও তাকে কারও সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হতে দেখা যায়। চেতনা প্রবাহরীতির মাধ্যমে আবদুল করিমের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা বলেছেন লেখক। এ গল্প বা একাঙ্কিকা মূলত নাগরিক জীবনের নৈঃসঙ্গ, নির্জনতা, একাকিত্ব এবং তা থেকে ব্যক্তিমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক প্রতিভাস। মনে হয় লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের নিঃসঙ্গতার ছায়া পড়েছে এ গল্পে।

চার.

তৃতীয় এবং শেষ গল্পগ্রন্থ '*ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প*' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'কোথায় পাবো তারে' (১৯৯৯)। পুরান ঢাকায় সামষ্টিক শ্রেণিচরিত্রের মাঝে আবদুল করিমের প্রেমের বিষয়টি অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ময়মনসিংহ বা ফুলবাড়িয়া যাওয়ার ঘটনায় মহল্লার সবাই আন্দোলিত হয়। 'ভূতের গলির এই মহল্লার লোকদের দিন উত্তেজনায় ভরে যায়, হালায় প্রেম করে নিহি, তারা বলে-- ফলে মহল্লার লোকদের রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয়, সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহে তারা বিছানায় জেগে থাকে।'[১২] পুরান ঢাকার শ্রেণিবদ্ধ চরিত্রের মধ্যে আবদুল করিমের প্রেম একটি নতুন উচ্ছ্বাস নিয়ে আসে। ঘটনা চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে এবংএ গল্পেও আমরা দেখি সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার বেড়াজালে বন্দি জীবনে মানুষ অসম্ভাব্যতার পেছনেই ধাওয়া করে। 'অলসের রাজা' আবদুল করিমের জীবনে প্রেম অসম্ভাব্যতা নির্দেশক। অদ্ভুত এক ঠিকানা সম্বল করে যদিও সে শেষপর্যন্ত শেফালিকে খুঁজতে যায়, কিন্তু বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারে এবং রাতেই ফিরে আসে। তখন "ভূতের গলির লোকেরা পরে বলে যে, তাদের জানা ছিল আবদুল করিম এমনই একটা কিছু করবে।"[১৩] এখানে কি আধ্যাত্মিকতা ভর করে লেখকের মনে? এ খোঁজ কি পরম কিছুর, যা চিরকাল অধরা? নাকি যান্ত্রিক জীবনে ভালোবাসার অনির্দেশ্যতার কথা বলে?

শহীদুল জহিরের গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যহলো একটি গল্পের মধ্যে আরেকটি গল্পের অন্তর্বয়ন। এমনি একটি গল্প 'আমাদের বকুল'(২০০০)। আকালু বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে একটি গাভী পায়। পরবর্তীতে দেখা যায় তার স্ত্রী ফাতেমা আর গাভীটির সমান্তরাল জীবনাচরণ– একই সঙ্গে গর্ভধারণ, একই সঙ্গে জমজ বাচ্চা প্রসব এবং একই সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সবই প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। ফাতেমার ছেলে মেয়ে আমির হোসেন আর বকুল ছাড়া বস্তুত কেউই আর তার জন্য অপেক্ষা করে না। শিশুদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য মোহসিন আলি মৌলভি বিচিকলার গাছ লাগিয়ে তাদেরকে ধৈর্য ধরতে বলে, গাছ বেঁচে থাকলে বোঝা যাবে তাদের মাও বেঁচে আছে। শিশু দুটি তাই আশাবাদী হয়। বকুলও কলাগাছের মতো বড়ো হতে থাকে এবং একসময় হারিয়েও যায়। গল্পে ফাতেমা এবং গাভীর দিক থেকে গল্প মোড় নেয় বকুলের দিকে। এই গ্রামের একটি মেয়ের হারিয়ে যাওয়া, যার স্বামী-সংসার সবই আছে– আপাত অবাস্তব ঘটনাটি পারিবারিক বা গ্রামীণ সমাজজীবনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না। আকালু দু'চার দিন তার খোঁজ করে চুপ করে থাকে। ফাতেমার হারিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন এ সমাজে নারীর অবস্থান কোনো গৃহপালিত প্রাণীর চেয়ে খুব উঁচুতে নয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আঠারো বছরের তরুণ শহীদুল জহিরের সংবেদনশীল সত্তায় গভীর ক্ষত তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধ। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। সেই অতৃপ্তি বা হাহাকার থেকে মুক্তিযুদ্ধকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে এনেছেন তাঁর গল্প উপন্যাসে। তাঁর 'মহল্লায় বান্দর, আবদুল হালিমের মা এবং আমরা' (২০০০)

গল্পে ভূতের গলির জনজীবনে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখি –'ভূতের গলিতেও অবধারিতরূপে একাত্তর সন নেমে আসে এবং আবদুল হালিম এই সময়ের পাকচক্রে ধরা পড়ে, আহা রে আবদুল হালিম, আহা রে আমার পোলা, বলে তার মা হয়তো নীরবে বিলাপ করে, মহল্লার লোকেরা এই কান্নার শব্দ শুনতে পায় অথবা পায় না।'[১৪]

বানরের উৎপাতে অতিষ্ঠ ভূতের গলির মানুষ প্রথমদিকে কারও ভাতের হাঁড়ি বা হাতঘড়ি বা হরলিকস এর বয়াম হারানোর ঘটনায় অন্যকে দোষারোপ করতে থাকে এবং ঘটনাগুলো রহস্যময়ই থেকে যায়। ধীরে ধীরে বানর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে।একই সমান্তরালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আবদুল হালিম আর ঝর্ণার প্রেম, যুদ্ধে পাকিস্তানি হায়েনাদের হাতে ঝর্ণার আকস্মিক মৃত্যু, আবদুল হালিমের যুদ্ধে যাওয়ার পথেই বুড়িগঙ্গার পানিতে ডুবে মৃত্যু এসবই লেখক বানরের গল্পের সঙ্গে বলে গিয়েছেন। ছেলের মৃত্যুর পর তার মা ছেলের তোষকের নিচে ঝর্ণার লাল সাটিনের ফিতা আবিষ্কার করেন এবং বহুবছর পর গৃহকর্মীর মেয়ে জবাকুসুমকে ফিতাটি দিয়ে চুল বেঁধে দেন 'এবং তারপর সেদিন মহল্লায় লাল চুলের ফিতার ইতিহাস প্রকাশিত হয়।'[১৫] যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর পাশবিকতার পাশাপাশি বানরদের এই সামান্য চুরিকে লেখক মানবিকই বলতে চেয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের জনজীবনে মানুষরূপী কিছু হায়েনার হিংস্রতা নৃশংসতার ভয়াবহতা লেখক শহীদুল জহির অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে এনেছেন তাঁর গল্প উপন্যাসে। তাঁর 'ইন্দুর বিলাই খেলা' গল্পে যুদ্ধের সময় ভূতের গলিতে হানাদার-রাজাকারদের নিয়মিত হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং সাধারণ মানুষের প্রাণ রক্ষার্থে পলায়নকে লেখক বলেছেন 'ইন্দুর বিলাই খেলা'– 'তারপর ভূতের গলিতে ৩০ মে রবিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় পাকিস্তানি মিলিটারি আসে। ... টিপু সুলতান রোডের মোড়ে ট্রাক থামার সঙ্গে সঙ্গে মহল্লায় খবর হয়ে যায়।... মহল্লার লোকেরা গাট্টি বোঁচকা মাথায় করে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বলধা গার্ডেন এবং হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভেগে যায়। মহল্লায় কোনো লোক না দেখে পাকিস্তানি মিলিটারি দলের নেতা লেফটেনান্ট শরিফ খেপে, সে বলে, কেয়া বাত হ্যায়, শালে লোগ সব ভাগ গিয়া? ... আবদুল গণি বলে, হালারা চুহা হ্যায়।... ইয়ে এক খেইল হ্যায়, ইন্দুর বিলাই খেইল হায়, চুহা বিল্লি হায়। তারপর মহল্লার চল্লিশটা বাড়ির ভেতর কেবল খতিজা বেগমদের ৩১ নম্বর বাড়িটা ছাড়া অন্য সব বাড়ি ২৭ অক্টোবর বুধবার পর্যন্ত মোট দুইবার করে পোড়ে।'[১৬]

এই খেলা মহল্লায় বলবৎ থাকে যুদ্ধের পরও এবং স্বাধীন দেশে সন্ত্রাসীরা নিরীহ মানুষের সঙ্গে এই জীবন-মরণ খেলায় লিপ্ত হয়। শিশুদের সাধারণ 'লৌড়ালৌড়ি' থেকে শুরু করে ডেঙ্গুজ্বর বা মানুষের জিম্মিদশা পর্যন্ত এই খেলায় প্রতিভাত হয়। লেখক এই খেলার মাধ্যমে ভিন্ন আঙ্গিকে একটি মহল্লায় তথা সমগ্র দেশে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রামকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। 'প্রথম বয়ান' (২০০২) গল্পে আবদুর রহমান শেপালি আকতারের প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অনেকটা খেয়ালের বশেই। পরবর্তীতে কৈশোরের সে প্রেম খুঁজে বেড়ায় সারাজীবন। শেপালি আকতার 'দান দান তিনদান' চেষ্টার পরও যখন আবদুর রহমানকে চম্পা ফুলের ডাল দিতে পারেনি তখন তার অভিমান হয় এবং পরিবারের বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে তার বিয়ে হয়ে যায় অন্যত্র। আবদুর রহমানের কাছে বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়েই থাকে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে হানাদারদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভূতের গলির বাসিন্দারা জিঞ্জিরায় আশ্রয় নেয়। তখন কোনো এক রাতে তাদের দুজনের দেখা হয় এবং শেপালির মুখে চম্পাফুলের গল্প শুনে 'আবদুর রহমানের মনে হয়তো দুঃখ জেগে ওঠে, অধিকারের ভেতরকার পাকা আম পঁচে গেলে যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখ, সেই শোক'[১৭]। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একরাত্রি গল্পের নায়কের কথা। কৈশোরে সুরবালাকে হেলায় হারনোর পর উকিল রামলোচন রায়ের স্ত্রী হিসেবে যখন তাকে আবিষ্কার করে তখনই নায়কের আত্মপীড়ন

শুরু হয়। এতকালের আত্মপ্রবঞ্চনার খতিয়ান নিয়ে 'বানের জল' থেকে বাঁচতে প্রলয়রাত্রে সুরবালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এবং কোনো কথা না বলে ফিরে যাওয়াকেই সে জীবনের পরম পাওয়া বলে মনে করে।'সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত'– এই বোধ আবদুর রহমানকে তাড়িয়ে বেড়ায় এবং বহুবছর পরেও 'কেরোসিন বাত্তি খোঁজার ছলে' তার বাল্যপ্রেমকেই খুঁজে বেড়ায়। কারণ "আবদুর রহমানের হয়তো এক শোক হয়। যে ঘটনা ঘটার সময় বোঝা যায় না, পরে বোঝা যায়, তার জন্য শোক করা ছাড়া আর গতি কী? ভূতের গলিতে আবদুর রহমান এই অবস্থায় পড়ে 'চাপা খায়া থাকে'।"[১৮]

পাঁচ.

মানবপ্রেমের পরিবর্তিত দর্শন নিয়ে নিরীক্ষাধর্মী গল্প 'ডলু নদীর হাওয়া' (২০০৩)। সামাজিক নিপীড়ন ও শোষণের শিকার নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে বিধাতার অভিশাপ হিসেবে আবির্ভূত হয় তৈমুর আলি চৌধুরী। আরাকান থেকে ফিরে আসা এই যুবকের হাত থেকে সাতকানিয়ার 'যুবতী বা অনতি যুবতীদের' কেউ রক্ষা পায় না। তারা 'গরিবের মধ্যে গরিব, ছেটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক' বলে তৈমুরের বাবার কাছেও এর কোনো প্রতিকার পায় না। গ্রামের সবাই করাতি বা মজুর– দারিদ্র্যসীমার নিচে তাদের বাস। এই দারিদ্র্যের সুযোগ নেয় তৈমুর আলির মতো সমাজপতিরা। সমর্তের বাবা জসিম করাতিকে নিজের কাঠের গোলায় কাজ দিয়ে আর পথের কাঁটা সমর্তের প্রেমিক সুরত জামালকে বহুদূরে আলিকদমে তার দুইশ বিঘা জমি দেখাশোনার জন্য নিয়োগ করে সমর্তের জন্য এক ফাঁদ তৈরি করে। তৈমুর যদিও 'কোয়ালে আছিলদে' বলে সে নিজেই সেই ফাঁদে ধরা পড়ে। মগ মেয়ে এলাচিং বা সমর্ত বানুর সৌন্দর্য তার কাছে আরাকানের জঙ্গলের মতো সবুজ, গভীর ও রহস্যময় বলে তাকে অধিকার করার পর বিয়ে করতেও মনস্থির করে এবং অদ্ভুত চুক্তির শর্তে রাজি হয়ে তাকে বিয়ে করে। প্রতিদিন দুই গ্লাস পানি থেকে হীরার বিষ মেশানো পানি আলাদা করে লটারি জেতার মতো জীবনে টিকে থাকতে হয় তৈমুরকে। প্রথমে সে এটাকে নিছক খেলা মনে করে বা সুরত জামালের প্রতি ঈর্ষা ও সমর্তের প্রতি ক্রোধে অন্ধ হয়ে মেনে নিলেও পরবর্তী চল্লিশ বছর এক কঠিন জাদুর বেড়াজালে বন্দি জীবন কাটায় এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এ গল্পে নরনারীর হৃদয়াবেগ বা প্রেমকে লেখক নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। সমর্তের প্রতি তৈমুরের প্রেম থাকলেও তৈমুরকে সমর্ত ভালোবেসেছিল কি না তা বলা মুশকিল। কুবের যেমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছিল হোসেন মিয়ার সঙ্গে, কোনোভাবেই বন্ধনমুক্ত হতে পারেনি; সমর্তও তেমনি মুক্তি পায়নি। চল্লিশ বছরের মরণফাঁদে তৈমুর আলি যখন ধরা পড়ে তখন সমর্ত বৃদ্ধা। তাদের বারো সন্তানের মধ্যে সর্বকণিষ্ঠ মিরাজ আলি চৌধুরীকে সমর্ত তার কথিত হীরার আংটি দান করে অর্থাৎ তৈমুর আলির সঙ্গে জড়ানো জীবন ত্যাগ করে চলে যায় আলিকদম। সুরত জামালের পরিণতি জানা যায় না। কিন্তু তার প্রেম সমর্তকে টেনে নিয়ে যায় বৃদ্ধ বয়সেও।

'আমাদের কুটিরশিল্পের ইতিহাস' (১৯৯৫) বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক অভিনব সংযোজন। বিষয়ে, ভাষাশৈলিতে, সংলাপে এবং চরিত্রে নিরীক্ষাপ্রবণতার বিস্ময়কর প্রকাশ এ গল্পটি। একটিমাত্র সুদীর্ঘ অনুচ্ছেদে কোনো পূর্ণ যতিচিহ্ন ব্যবহার না করেই তিনি শেষ করেছেন প্রায় সাতহাজার শব্দের এই গল্প। শুধু কমা ও সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন তিনি। গল্পটি শেষও করেছেন কমা দিয়ে। এ গল্পে দক্ষিণ মৈশুন্দির সামষ্টিক চরিত্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে 'তরমুজ'। ছোটগল্পের চারিত্র্য একক সুনির্দিষ্ট কাহিনি, কয়েকটিমাত্র চরিত্র, অথবা সুনিয়ন্ত্রিত সময়ের গাঁথুনির বদলে আমরা এই বড়গল্পে অথবা নভেলায় কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা,

ধনী অভিজাত পরিবার থেকে শুরু করে প্রতিদিন খেটে খাওয়া নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনবয়ান, দক্ষিণ মৈশুন্দির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সূক্ষ্ম তীর্যক রোজনামচা পেয়ে যাই। বিচ্ছিন্ন এসব ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষা করতে বারবার তরমুজের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন এবং কালিক বিবর্তনের সাক্ষী হিসেবে তরমুজের দামকে ব্যবহার করেছেন। পরিশেষে, জীবনের ক্ষণকালীন নশ্বরতা ও হাহাকারের দর্শন বোঝাতে হাজী ফুড প্রোডাক্ট এর তরমুজের টিনজাত বাণিজ্যিক শিল্পায়নের মাধ্যমে বড়োগল্পটির মাঝে জীবনের মধুরতর প্রেমের অকালে ঝরে যাওয়া অনেকটা অগোচরেই রেখে দিয়েছেন।

গ্রামীণ পটভূমিতে শহীদুল জহিরের গল্প সংখ্যায় অল্প হলেও তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য এবং নিম্নবিত্তের অসহায় আত্মসমর্পণ আশ্চর্য দক্ষতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। দারিদ্র্য আর বঞ্চনার শিকার এ মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের উঁচুতলার মানুষের দয়ায় বেঁচে থাকে। এমনি একটি শিল্পভাষ্য 'কার্তিকের হিমে, জ্যোৎস্নায়'। ভূমিহীন, 'অলসের রাজা' কৃষক ফৈজুদ্দিন তার স্ত্রী গুলনেহারকে নিয়ে অন্যের জমিতে তৈরি ভাঙাচোরা খড়ের কুঁড়েঘরে বাস করে। 'কুঁইড়ার বাদশা' দার্শনিক ফজু স্ত্রী গুলনেহারকে বোঝায়, 'এত কাম কইরা কি আমি জমিদার হমানে'? তাই জংলা শাক, কচুঘেঁচু খেয়ে তার দিনাতিপাত করতে হয়। সমাজপতি আবদুল কাদের মিয়া 'এই সকল ধান এই মাঠ এবং জমি, মাঠের উপরকার দিগন্তছোঁয়া আকাশ' এর মালিক। তাঁর ধানক্ষেতের আইলের ওপর দিয়ে হাঁটার অধিকারও নেই ফজুর। তাঁর জুতো খোঁজা বা ক্ষেতের ইঁদুর মারার জন্য সামান্য টাকার লোভ দেখিয়ে 'ইন্দুর-বিলাই খেলা' খেলেন তিনি। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ ডবল নিউমোনিয়ার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারলেও বাইশ বছরের ফজু মরে যায় হাইপোথার্মিয়ায়। এ যেন দরিদ্রের নিয়তি। পারিবারিক ডাক্তারের এ ঘোষণা যেমন ইঙ্গিতবহ, তেমনি গুলনেহারের অদৃশ্য হয়ে যাওয়াও রহস্যময়। পরিবারের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য ক্ষমতাধরদের বিছানো কার্পেটের তলায় ফজুর মতো অসহায় মানুষ 'চাপা খায়া' থাকে। নরনারীর পারস্পরিক কামনা নিয়ে শহীদুল জহির বিভিন্নভাবে নিরীক্ষা করেছেন। এ গল্পে বিপত্নীক বৃদ্ধ কাদের মিয়ার আঠারো বছরের গুলনেহারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং গুলনেহারের আত্মসমর্পণ এ সম্পর্ক নিয়ে পাঠককে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

ছয়.

শহীদুল জহির পাঠকের মনোযোগ প্রত্যাশী একজন লেখক। সাদা চোখে তাঁর গল্পের মর্মোদ্ধার কঠিন। তাই হয়তো তাঁর পাঠকসংখ্যাও কম। তিনি মানবজীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গকে গল্পের বিষয় করেছেন। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ থেকে শুরু করে কখনও মহল্লা, কখনও বানর, কখনও সময় আবার কখনও তরমুজের মতো একটি ফলও হয়ে ওঠে চরিত্র।

নীরবে, নির্জনে সাহিত্যচর্চা করে তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক ধারার ছোটগল্প উপহার দিয়েছেন যার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে বিস্ময়, আছে নতুনের হাতছানি এবং নতুন করে আবিষ্কারের আনন্দ। মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ঘুরে এলেও তাঁর অধিকাংশ গল্পের কেন্দ্রবিন্দু পুরান ঢাকার ভূতের গলি কিংবা ভজহরি সাহা স্ট্রিট। নিজের জন্মস্থান বা বেড়ে-ওঠার স্থানের প্রতি এমন মমত্ব, এতো দায়িত্ববোধ অন্য কোনো লেখক অনুভব করেছেন কিনা বলা মুশকিল। নিজ মহল্লার অলিগলি, রাস্তাঘাট, পার্ক, খেলার মাঠ, প্রতিটি বাড়ির অন্দরমহলের বর্ণনা এবং মানুষের মুখের ভাষাও এতো নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছেন যে মনে হয় তিনি নিজের জন্মস্থানের ঋণ শোধ করতে ব্রতী হয়েছেন। চলিত বা প্রমিত ভাষার ওপর তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি মনে করতেন, এই ভাষার প্রাণ নেই। ভাষাকে প্রাণ দেবার জন্য তাই ভাষাজনিত নানা নিয়মনীতি ও সংস্কার ভেঙে দিয়ে আঞ্চলিক ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। গতানুগতিক ভাষার জীর্ণতাকে ভেঙে দিয়ে জীবনের প্রাণস্পৃহাকে ধারণ করার জন্য এ ভাষা অবলম্বন করেছেন এবং এভাবেই ভাষার বিবর্তন ঘটে বলে তিনি মনে

করতেন। সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বর্ণনায়ও তিনি একই ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'খাড়ায়া', 'খায়া', 'নিচা', 'যায়া', 'ফালায়া', প্রভৃতি শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করেছেন এবং কোনোটিই খাপছাড়া মনে হয়নি। আবার 'ডলু নদীর হাওয়া' গল্পে সাতকানিয়ার আঞ্চলিক ভাষা যখন ব্যবহার করেছেন তখন পাঠকের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন। সংলাপের পরপরই কথাগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে নিজেই অনুবাদ করে দিয়েছেন। বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে তাঁর এ সাবধানী কৌশল মেধাবী লেখক শহীদুল জহিরকে অনন্যতা দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা। শহীদুল জহিরের প্রিয় 'ভূতের গলিতেও অবধারিতরূপে একাত্তর সাল নেমে আসে'। মুক্তিযুদ্ধ লেখকের সত্তায় ভয়াবহ বীভৎসতার ছাপ রেখে গেছে। তাই তাঁর গল্পে উপন্যাসে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনি আর নরপশু রাজাকার মিলে যুদ্ধের সময় যে নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে, লেখক তাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বর্ণনা দিয়েছেন।একাত্তরে আঠারো বছরের তরুণ শহীদুল জহিরের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে জনজীবনে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও হিংস্রতার বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলো। লেখক ও সমালোচক দেবেশ রায় তাই বলেছেন, 'যূথস্মৃতিভুক্ত ইতিহাসের এমন পুনরুদ্ধারকথা আমি আর কোথাও পড়িনি।'[১৯]

স্বনির্ভর লেখক শহীদুল জহির পাঠককে গল্পে সম্পৃক্ত করার জন্য শুরু থেকেই একটা ঘোর তৈরি করেন। তাঁর গল্পে 'আমরা' বা 'ভূতের গলির লোকেরা' গল্প বলে, যারা সবসময়ই সংশয়ে ভোগে। তিনি সমষ্টির চোখে দেখা বিভিন্ন প্রস্তাবনা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করে অনেকগুলো সম্ভাবনা জিইয়ে রাখেন, যেন পাঠক যেকোনো একটি বেছে নিতে পারে। যেমন, 'প্রথম বয়ান' গল্পে আছে–'তখন একদিন সুপিয়া আকতার যেন কোথায় গেছিল, গেলে ফিরা আসতে হয়, তাই কোত্থেকে যেন সে ফিরা আসে, তার পরনে বোধহয় শাড়ি, অথবা হয়তো সালোয়ার কামিজই ছিল, সঙ্গে যেন কে, হয়তো তার আম্মা, না হয় দাদি আম্মা। তারা সেই বিকালবেলা জোড়পুলের দিক থেকে মহল্লার ভিতর দিয়া হেঁটে আসে এবং তাদের হাতে, হয়তো সুপিয়ার হাতে কিংবা তার মা অথবা দাদির হাতে চম্পা ফুল গাছের একটা ভাঙ্গা ডাল দেখা যায়... এতদূর থেকে এই ডাল বয়া আনতে যায়া সুপিয়ার শেষমেষ বাড়ির কাছে এসে কাহিল লাগে, একটা মেয়ের কাহিল লাগতে পারে, ফুলের ডালটা হয়তো ভার মনে হয়, ফলে সে– অথবা হয়তো তার কাহিল লাগে না...।'[২০]

এখানে 'হয়তো', 'কিংবা', 'অথবা', 'যেন', 'না হয়' এমন সংশয়ের যেন মেলা বসেছে। এসব সংশয়ের মধ্য দিয়ে ঈষদচ্ছ একটি ছবি উপস্থাপন করাই তার উদ্দেশ্য। সবকিছু খোলাসা করে বলতে চান না তিনি। এভাবে তিনি পাঠকের মনোসংযোগ তৈরি করেন। দীর্ঘ বাক্যেও তাই পাঠক খেই হারিয়ে ফেলে না।

পুরান ঢাকার সামষ্টিক জীবনে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার পর সবাই মিলে যেভাবে আলোচনায় মেতে ওঠে এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে নিজের মতো করে ঘটনার ব্যাখ্যা করে, শহীদুল জহিরের গল্পের বর্ণনাভঙ্গিও তেমনি, যেন তিনি এই জনসমষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের একজন হয়েই গল্পটি বলছেন। তাঁর চরিত্ররা নিয়তিতাড়িত। তাই গল্পের পরিণতিও তিনি আগেই জানিয়ে দেন। গল্পগুলো অনেকটাই বৃত্তীয় গতির। কখনও একটি গল্পের আড়ালে বলে যান অন্য একটি গল্প। কখনও গল্পহীনতার গল্প, আবার কখনও একসঙ্গেই বলেন কয়েকটি গল্প। তিনি যেন সেই বাঁশিওয়ালা, বাঁশিতে যখন সুর তোলেন, পাঠক নিবিষ্ট হয়ে যায় সেই সুরে। সুরটি অপরিচিত হলেও, তার মোহমায়া ত্যাগ করতে পারে না পাঠক। তাই আকালু, মোহাম্মদ সেলিম বা সুপিয়া আকতার বিভিন্ন গল্পে ঘুরে ফিরে এলেও তাদের একঘেয়ে মনে হয় না। এজন্যই তাঁর প্রতিটি গল্পই স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর।

শুরুতেই পরিণতি নির্দেশ করে গল্পের ক্রম বর্ণনারীতি ভেঙে দিয়েছেন তিনি। 'টান টান উত্তেজনা' থেকে পাঠককে বঞ্চিত করেছেন। গল্পটি হয়তো তখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃত্তীয় গতির। শুরুতেই শেষ বুঝতে পারার

ফলে পাঠে মনোযোগ কমে যাওয়া স্বাভাবিক হলেও লেখকের বয়ানরীতির জাদুতে মধ্যবর্তী অনুঘটনাগুলো পাঠককে চক্রে আটকে রাখে। বলা বাহুল্য, এ চক্র শহীদুল জহিরের গল্প সাধনায় পাঠককে নিমগ্ন করে।

সাত.

তাঁর ছোটোগল্পের ধারা পর্যবেক্ষণে প্রথম দিকের লেখা ছোটোগল্পগ্রন্থ 'পারাপার' হতে পরবর্তীকালের লেখা ছোটোগল্পে বিষয়গত একটি সূক্ষ্ম উত্তরণ ধরা পড়ে। শুরুর দিকে যেন তিনি চিরায়ত ধারায় গল্পের ঘটনার ওপর গুরুত্ব দেন, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ের রচনায় স্পষ্টত ধরা পড়ে ঘটনা নয়, বর্ণনাভঙ্গির অভিনবত্ব, যে প্রাতিস্বিক বয়ানকৌশল তাকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জাদুবাস্তববাদী গল্পকার করে তুলেছে।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য প্রথমাবধি পাশ্চাত্য সাহিত্যান্দোলন প্রভাবজাত। বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছিলেন রোমান্টিসিজম দিয়ে, তারপর বিশ্বযুদ্ধ প্রভাবজাত বাস্তবতা, রিরংসা, যৌনতা, মনোসমীক্ষণ, অস্তিত্ববাদ, উদ্ভট (এ্যাবসার্ড), উত্তরাধুনিকতার মহাসমুদ্রের ওপারের ঢেউ বাংলা সাহিত্যের উপকূলে আছড়ে পড়েছে। এদেশের সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে, করে তুলেছে সংবেদী ও শাণিত। এর সর্বশেষ যে ঢেউ গত শতাব্দীর শেষদিকে বাংলা সাহিত্যকে দোলায়িত করে, তা হলো জাদুবাস্তবতা।

জাদুবাস্তবতার উৎস কী? কোন মাটিতে জন্মে এর গাছ? এই প্রসঙ্গে যাদুবাস্তবতার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব আলেহো কার্পেন্তিয়ার বলেছিলেন, আর যাই হোক, আমেরিকার সম্পূর্ণ ইতিহাস অতিবাস্তবতার এক ক্রমবিবরণী ছাড়া আর কী! এই ইতিহাসের গভীরে লাতিন আমেরিকার শিকড়, এখানেই ম্যাজিক রিয়ালিজম আশ্রয় নেয়।

এখানেই কথা থাকে জাদুবাস্তবতার প্রয়োজনীয় ইতিহাসের পটভূমির। কারণ হিসেবে আবিষ্কার করা যায় আমাদের পুরাণ। যে যে সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার সফল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, সেই সকল সাহিত্যের বা অঞ্চলের এই মৌল বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা জাদুবাস্তবতার উত্তরাধিকারে পাওয়া যায় যে, তাদের সবারই রয়েছে বৈরী প্রতিবেশ অথবা ঔপনিবেশিক যাঁতাকলের পীড়ন এবং গভীরসঞ্জাত পুরাণ। একইসাথে তা বহু সংস্কৃতি ও বহু বাস্তবতার বহুত্বকে ধারণ করে।

যখন উত্তর-ঔপনিবেশিক– উত্তরাধুনিক শেকড়সন্ধানী অভিযাত্রায় অন্তসলিলা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, অবাস্তবের বাস্তবময় বয়ানকৌশলে, বিরূপ সময়জাত রিরংসা ও বাস্তবতার আঘাতকে বর্ণনা করতে চায়, তখনই সেটি হয়ে ওঠে জাদুবাস্তবতা। তাই এ শুধু অতীতের রূপকথায় ডুব দেয়া নয়, বর্তমানের যুগযন্ত্রণা ও তৎপ্রতিকারের তীব্র আকাঙ্ক্ষাজাত কল্পনার সংমিশ্রণ কৌশলমাত্র, যা শহীদুল জহিরের গল্পে অনায়াস দক্ষতায় ব্যবহৃত হতে দেখি। মনে পড়ে জাদুবাস্তববাদের প্রবাদপ্রতিম গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এর কথা, কলাম্বিয়ার তরুণ ঔপন্যাসিক পি- নিও আপুলেইয়া মেনদোসাকে তিনি বলেছিলেন–"একশো বছরের নিঃসঙ্গতাই হোক, কিংবা আমার অন্য যে কোনো বইই হোক, আমার লেখার প্রতিটি পঙক্তির যাত্রাভূমি নিখাদ বাস্তব থেকে। আমি শুধু একটি আতশকাঁচ দিই, যাতে পাঠক বাস্তবকে ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনাকে। সরলা এরেন্দিরা গল্পে আমি দেখাই যে ইউলিসেস কোনো কাঁচ ছুঁলেই তা অনবরত রঙ পাল্টাতে থাকে। এখন এটা তো আর সত্যি সত্যি হয় না। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে এত কথা আগেই বলা হয়ে গেছে যে, এই ছেলেটি যে প্রেমে পড়েছে এটা বলবার জন্য আমাকে নূতন একটা প্রকাশভঙ্গি উদ্ভাবন করে নিতে হয়েছিল। কাজেই আমি দেখাতে থাকি কাঁচের রঙ পাল্টে যাচ্ছে আর তার মাকে দিয়ে বলাই,'ও-সব জিনিস হয় শুধু প্রেমে পড়লেই... মেয়েটি কে শুনি?' যেকথা অজস্রবার বলা হয়ে গেছে, প্রেম কেমন করে জীবনটাকে ওলটপালট করে দেয়, এটাই তো কথা, সে-কথাই আমি বলতে চাইছি। শুধু আমার বলবার ধরণটা

অন্যরকম।"[২১] এই বিশেষ বলবার ভঙ্গিটিই জাদুবাস্তববাদ, যা শহীদুল জহির ব্যবহার করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। 'বিষয়টি যতটা না ব্যক্তিমুখী, তার চেয়ে বেশী সমাজমুখী। জাদুবাস্তবতায় বাস্তবসম্মত পরিস্থিতি তৈরি করে তার ভেতর জাদু-উপকরণের অবাস্তবতাকে প্রবেশ ঘটানো হয়। এই দুয়ের সম্মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্য হলো বাস্তবতাকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধিতে আনা।'[২২]

শহীদুল জহির এর গল্পে জাদুবাস্তবতার সফল প্রয়োগ চোখে পড়ে। মার্কেজ এর মতোই তিনি ভীষণভাবে দেশজ প্রকরণকেই জাদুবাস্তবতার উপকরণ করে তুলেছেন। তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' গল্পে আপাত ফুলগাছপ্রেমী আব্দুস সাত্তার আসলে যান্ত্রিক নগরের যাঁতাকলে আটকে পড়া মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী, কলোনিবাসী বিচ্ছিন্নতাবোধ -আক্রান্ত একজন মানুষ। ভূমিকম্পের সময় সে ফুলের টব বাঁচাতে গিয়ে ভবনের বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে মারা পরে, তখন টবে তার নিজহাতে লাগানো নয়নতারা গাছগুলোও একে একে আত্মহত্যা করতে থাকে। সেই নয়নতারা গাছ, যার বেগুনি রঙের ফুলেই শুধু আকৃষ্ট হলুদ প্রজাপতির বিশাল দল কলোনীকে বিখ্যাত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তার মৃত্যুর পর এই কলোনিতে আর কোনো নয়নতারা গাছ হয় না। শুধুমাত্র মাটির যেখানে তার মগজ মিশেছিল, সেখানে জন্মানো চারটি নয়নতারা বেঁচে থাকে, তাদের সরানোর চেষ্টা হলে তারাও অন্য মাটিতে ক্রমশ মুমূর্ষু হয়ে পড়ে, এই মাটিতে ফিরিয়ে আনলে আবার বেঁচে ওঠে। প্রকৃতি ও মানুষের চিরন্তন সম্পর্ক ও বৃক্ষের অনুভূতিসঞ্জাত চেতনার পরিচয়বাহী এই গল্পে তিনি জাদুবাস্তবতার মধ্য দিয়ে ইকোক্রিটিসিজম ও মেগাসিটি হয়ে ওঠার পথে যান্ত্রিক নগরজীবনের এলিয়েনেশন তুলে ধরেন।

'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' গল্পে কাক কর্তৃক সরল ও নিরপরাধ আকালু ও টেপিকে প্রতিপালন এবং তাদের বিপদসময়ে ঠোঁটে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া জাদুবাস্তবতার ইঙ্গিতবহ। রূপকথার আবহে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের শোষিত হতে হতে নির্যাতিত উন্মুল হবার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। দাঁড়কাকের সাথে টেপির বাক্যালাপ, কাকের ইঙ্গিতে টেপির জেদ ও আকালুর কাঠ চেরাই কাজ গ্রহণ, গাছের কোটরে প্রাপ্ত বিশাল টাকার বান্ডিলের অলৌকিকতা এবং কাকের ঠোঁটে করে উড়ে যাওয়ার গল্প জহির অনন্য বিশ্বাসযোগ্যতায় উপস্থাপন করেছেন। আকালু-টেপির মতো অন্ত্যেবাসী মানুষ শুধু গল্পের শেষে নয়, মাঝেও একবার গ্রাম থেকে পালিয়েছে। তাদের সমগ্র জীবনটাই যে বেঁচে থাকবার চেষ্টায় মৃত্যুর কাছ থেকে সতত পলায়নপরতা– সেকথাই লেখক বলতে চেয়েছেন। একইসাথে প্রান্তবাসী আকালু-টেপির মতোই ব্রাত্য পাখি কাক এর উল্লেখ আমাদের মননে নিম্নবর্গের প্রতি সচেতনা জাগিয়ে দেয়।

সবচেয়ে সার্থকভাবে জাদুবাস্তবতা ব্যবহৃত হয়েছে তার 'ডুমুরখেকো মানুষ' গল্পে। অদ্ভুতুড়ে ডুমুর ও তার বিক্রেতা, সকলের সামনে হাড় থেকে ক্রমশ সুন্দরী যুবতীতে রূপান্তরিত নারীমূর্তি জাদুর কুহক ও প্রতীকময়তায় আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। অন্যদিকে বুড়িগঙ্গার তীরে তার রাজপ্রাসাদ, ডুমুরবাগান, আবদুল-প্রীতিলতা নামক দুই হাড়কে নিয়ে তার আরব্য রজনীর জাদুগীরের জীবনযাপন জাদুবাস্তবতার কুহকে আমাদের আপ্লুত করে, ভোগবাদী সমাজের চাহিদা তৈরি ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার অভ্যস্ত পরিপূরণে সীমাহীন লোভ প্রতিটি মানুষকে যে পশু ও হন্তারকে পরিণত করে আত্মার মৃত্যু ঘটায়- এই বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে জহির আশ্রয় নেন জাদুবাস্তবতার।

'কাঁটা' গল্পে একই বাড়ির একই কুয়োয় সুবোধচন্দ্র ও তার স্ত্রীর বার বার ভাড়া আসা আর ডুবে মরার জাদুবাস্তববাদী উপস্থাপনায় আমাদের অন্তরের গহীন সাম্প্রদায়িকতার কুয়োর কথাই কি মনে করায় না? নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিবেশিরা তাদের কুয়োতে ফেলে হত্যা করে। কিন্তু তাদের অনুশোচনাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে একই নামে দম্পতি আবারও ফিরে আসে সেই বাড়িতে, আবারও মরার জন্য।

'আমাদের বকুল' গল্পে ফাতেমার যৌবনদীপ্ত দেহবল্লরীর সাথে সাথে একইসাথে কাজলা গাই ও তার সন্তানধারন, জমজ সন্তান প্রসব, ছুঁড়ে ফেলা ভাতের হাড়ির আঘাতে বিরাট বোয়াল মাছের মৃত্যু, বিচিকলার গাছকে ফাতেমার অস্তিত্ব কল্পনা করা, কদলীকাণ্ডের সাথে বকুলের দেহসুষমাগত সাদৃশ্য, বকুলের রহস্যজনক অপমৃত্যু ও অপেক্ষারত লাল পিঁপড়ের ডাই এসে বকুলের দেহ বিচিকলার গাছের গোড়ায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলার মধ্যে অলৌকিক আবহে জাদুবাস্তবতার কৌশলে নারীর প্রতি অবহেলা ও অপরাধের চিরাচরিত চিত্রই নতুন বাণীরূপ লাভ করেছে।

এই গল্পগুলোয় তার বাস্তবের সাথে অবাস্তবের মিশেল অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক! মনে পড়ে মার্কেজ এর জাদুবাস্তববাদী বয়নকৌশল সম্পর্কে টিপ্পনী– "যদি আপনি বলেন আকাশে হাতি উড়ছে, কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যদি আপনি বলেন, আকাশে ৪২৩টি হাতি উড়ছে, মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করতেও পারে।"[২৩] তাঁর ইঙ্গিত ছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেইলসের প্রতি, যা শহীদুল জহিরের বর্ণনাভঙ্গিতে চোখে পড়ে। শহীদুল জহির নিজেই বলেছিলেন, "জাদুবাস্তবতা এক জিনিস, মার্কেজ অন্য জিনিস। জাদুবাস্তবতাকে মার্কেজ ব্যবহার করেন, আমিও তা ব্যবহার করি। হ্যাঁ, আমি এটা মার্কেজের লেখা পড়ে জানি, এবং দেখি পৃথিবীর সব দেশেই জাদুবাস্তবতার অভিন্ন উপাদান আছে। আমাদের দেশেও সেইরকম অনুষঙ্গ আছে। আমি চেষ্টা করেছি আমার লেখায় সেসব আনতে।"[২৪]

শহীদুল জহির তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ '*ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প*' (১৯৯২) থেকে যে কুয়াশাচ্ছন্ন বর্ণনাকৌশল অবলম্বন করেছেন, তাঁর গল্প উপন্যাসে তা বহমান ছিল শেষ অবধি। তিনি নিজেই বলেছেন 'আমি কোনো সিঙ্গেল পিকচার প্রেজেন্ট করতে চাই না।'[২৫] তাই একই ঘটনা বারবার বর্ণনা করে একটু একটু করে গল্প এগিয়ে নেন। পিরামিডের মতো এ গঠনকৌশলে লেখক যেন প্রচলিত গল্প সামগ্রিক সমাজের মুখের কথা হিসেবে বলে যান।

হাফিজদ্দি, আবেদা, মোহাম্মদ সেলিম, শিরিন আকতার, আবদুল করিম, আবদুল হালিম, সুবোধচন্দ্র, স্বপ্না, সুপিয়া আকতার, পুতুল বেগম– এই সব নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক সামাজিকতার গল্প আশ্চর্য মমতার পরশ বুলিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত করার জন্য পুরান ঢাকাকেই ক্যানভাস বানিয়েছেন সময় অতিক্রমকারী কথাশিল্পী শহীদুল জহির। তাঁর হাত ধরে পুরান ঢাকা স্বমহিমায় বাংলা সাহিত্যে অবস্থান করবে অনন্তকাল- একথা এখন বলাই যায়।

তথ্যনির্দেশ

[১] আবদুল মান্নান সৈয়দ, "শহীদুল জহিরের গল্প", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ৮০৬

[২] কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর ধৃত সাক্ষাৎকার, *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ৯৩২

[৩] শহীদুল জহির, "ভালোবাসা", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ২২

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] শহীদুল জহির, "তোরাব শেখ", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ.২৬

[৬] শহীদুল জহির, "পারাপার", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ৩৮

[৭] শহীদুল জহির, "আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই ", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ৬৩-৬৪

[৮] শহীদুল জহির, "এই সময়", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩)

পৃ. ১০৫

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[১০] শহীদুল জহির, "কাঁটা", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ১৩১

[১১] শহীদুল জহির, "ধুলোর দিনে ফেরা", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ১৪০

[১২] শহীদুল জহির, " কোথায় পাব তারে ", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ.১৮৭

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

[১৪] শহীদুল জহির, "মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ.২১০

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২-২৩৩

[১৭] শহীদুল জহির, "প্রথম বয়ান", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ২৫৬

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

[১৯] দেবেশ রায়, "এখনও অপেক্ষা ও শহীদুল জহিরের মৃত্যু", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ৮২০

[২০] শহীদুল জহির, "প্রথম বয়ান", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ.২৫২-২৫৩

[২১] মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাস্তবের কুহক, কুহকের বাস্তব*, (ঢাকা, কাগজ প্রকাশন, ২০০৩) পৃ. ৩৩

[২২] মোজাফ্ফর হোসেন, 'জাদুবাস্তবতা, পরাবাস্তবতা এবং হারুকি মুরাকামির গল্পপাঠ', অনলাইন পত্রিকা 'দেশেবিদেশে ডটকম', ১৯ নভেম্বর, ২০১৮

[২৩] পিটার এইচ স্টোন এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, *দ্য প্যারিস রিভিউ ইন্টারভিউস: রাইটার্স এট ওয়ার্ক*, ভাইকিং/ পেঙ্গুইন, ১৯৮৪, পৃ. ৩২৪

[২৪] হামীম কামরুল হক কৃত সাক্ষাৎকার, 'ছোটোকাগজই হলো সাহিত্যের যথার্থ উৎসভূমি: শহীদুল জহির', হামীম কামরুল হক, *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ-৯৮০

[২৫] আহমেদ মোস্তফা কামাল কৃত সাক্ষাৎকার, "আমার তো মনে হয় জীবনের ব্যর্থতাগুলোও একধরনের ঐশ্বর্য", *শহীদুল জহির সমগ্র*, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৩) পৃ. ৯৬০

কোহিনূর পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নারায়নগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ
মুঠোফোন: ০১৭১০৯২৪৯৫৪; ইমেইল: kohinoorpervin@gmail.com